ড. মো. সিরাজুল ইসলাম

উন্নত বিশ্ব থেকে উন্নয়নশীলদের ক্ষতিপূরণ আদায় কত দূর?

২০২৩ সালটি ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণতম বছর। ফলে এ বছর জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন বা 'কপ২৮' বিশেষ গুরুত্ব বহন করে হয়তো-বা। প্রতি বছর, বিশ্বের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকদের উপস্থিতিতে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন বা 'কপ' অনুষ্ঠিত হয়। মূলত 'কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ (সিওপি), যার বাংলা উচ্চারণ 'কপ', এর সদস্য হলো সেই দেশগুলো যারা ১৯৯২ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত 'জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)' চুক্তি সই করেছে। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের ঘনত্ব কমিয়ে আনা তথা স্থিতিশীল করার জন্য একত্রে কাজ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে চুক্তিটি প্রস্তাবিত হয়েছিল। তারপর থেকে দলগুলো বা দেশগুলো প্রতি বছর বার্ষিক সম্মেলন করে থাকে।

গতবারের জলবায়ু সম্মেলন 'কপ ২৭' অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২২ সালের নভেম্বরে মিসরীয় শহর শার্ম এল-শেখে। এতে প্রায় ২০০টি দেশের শতাধিক রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধি মিলিত হয়েছিলেন। সম্মেলনটির উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাবগুলোর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বা এরই মধ্যে ভুগছে এমন দেশগুলোর জন্য 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' বা ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য তহবিল করার একটি চুক্তি। জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস এ চুক্তিকে 'ন্যায়বিচারের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ' বলে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি সীমিত করার জন্য ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস লক্ষ্যমাত্রার অঙ্গীকার আবারো পুনর্ব্যক্ত করা।

কপ২৮ সম্মেলনটি এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনা মূলত দুটি ধারায় বিভক্ত। একটি হচ্ছে প্রতিরোধমূলক, অর্থাৎ বিশ্বের তাপমাত্রা যাতে আর না বাড়ে তার ব্যবস্থা নেয়া। অন্যটি হচ্ছে প্রতিকারমূলক, অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির পর ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো কীভাবে অভিযোজন করবে। কপ২৮-এ আবারো বিষয় দুটি নিয়েই আলোচনা হবে। উদ্বোধনী বক্তৃতায় জাতিসংঘ মহাসচিব সম্মেলনটি সফল করতে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যাতে উভয় ইস্যুকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথমত, গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন অতিদ্রুত কমানো, অন্যথায় তা বেড়ে এ শতাব্দী শেষে ৩ ডিগ্রি দাঁড়াতে পারে। দ্বিতীয়ত, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বাড়ানো। তৃতীয়ত, কার্বন নির্গমনের জন্য দায়ী নয়, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে ভুক্তভোগী দেশগুলোর জন্য 'অভিযোজন' কিংবা 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিলের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করা।

ভালো খবর হচ্ছে, সম্মেলনের প্রথন দিনেই, 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিলের একটি প্রতিশ্রুতি গৃহীত হয়েছে। কিছু দেশ এরই মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন। এছাড়া এবারের সম্মেলনে বেশকিছু নতুন ধারণা তথা কার্যাবলি যুক্ত করার আশা রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রথমবারের মতো 'গ্লোবাল স্টকটেক' প্রতিবেদন। মূলত প্যারিস চুক্তির অংশ হিসেবে প্রতিটি সদস্যদেশকে তার দেশের গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের বর্তমান অবস্থা, নিঃসরণ কমানোর পদক্ষেপের অগ্রগতি—এ সবকিছুরই বিস্তারিত তালিকা, পরিমাণ ও অর্জনের একটি হিসাব এখানে তুলে ধরতে হবে। মূলত দুই বছর ধরে এটি চলছে এবং কপ২৮-এ তা উপস্থাপন হওয়ার কথা। আবার প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তা নিয়মিত এই 'স্টকটেক' করতে হবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে, শুধু কথা নয় বাস্তবে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে কোন দেশ কতটা অগ্রগতি অর্জন করেছে তার প্রকৃত চিত্র জানা।

জীবাশ্ম জ্বালানি মুক্ত একটি পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকারও কপ২৮-এর একটি অন্যতম এজেন্ডা। জাতিসংঘ মহাসচিব প্রথম দিনই বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, যথা সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ ইত্যাদি দ্রুত বাড়ানো এবং এ বিষয়ে গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। কিছু উন্নত দেশ কর্তৃক, ২০৫০ সালের মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুতের কার্যক্রম বর্তমানের চেয়ে তিনগুণ করা হবে বলে এরই মধ্যে ঘোষণা এসেছে, যা প্রায় ২২টি দেশ সমর্থন করেছে। তবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কতটা পরিবেশবান্ধব এ ব্যাপারে বিতর্ক আছে। এক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও সবুজ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ২০৩০ সালের মধ্যে তিন গুণ বাড়ানোর আরেকটি প্রস্তাবে সায় দিয়েছে প্রায় ১১৫টি দেশ। কয়লার ব্যবহার কমানোর ব্যাপারে বরাবরই পরিবেশবাদীরা সোচ্চার ছিলেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সুলতান আল-জাবের এবারকার সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছেন। তার প্রধান ভূমিকা নিয়েও সমালোচকরা নাখোশ, কেননা তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের শিল্পমন্ত্রী ও দেশটির জাতীয় জ্বালানি তেল কোম্পানির প্রধান।

একইভাবে জলবায়ু অর্থায়নের ব্যাপারে বরাবরের যে ধীরগতি তা কীভাবে আরো কার্যকর করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা চলবে নিঃসন্দেহে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেই সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু প্রকল্পগুলোয় সাহায্য দিতে ৩ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের একটি নতুন বেসরকারি বিনিয়োগ তহবিল গঠন করার কথা জানিয়েছে। ইউএই আশা করছে যে 'আলতেরা' নামক এ নতুন তহবিল ২০৩০ সাল নাগাদ মোট ২৫ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে।

আসলে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত এ জলবায়ু সম্মেলনে বরাবরই কিছু প্রতিশ্রুতি ও কর্মপরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এর কোনোটিই পুরোপুরি সফল হয় না। যেমন চুক্তির আওতায় প্রতি বছর উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি করলেও বাস্তবে তার খুব অল্পই পাওয়া গেছে। মূলত এই 'কপ' সম্মেলনটিতে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় 'কনসেন্সাস' বা 'সর্বসম্মতিক্রমে'। আবার এ সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতাও নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও পরবর্তী সময়ে তেমনটা কার্যকর হতে দেখা যায় না। তবে তর্ক-বিতর্ক চলে বিস্তর। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে এসব বিতর্ক বা দরকষাকষিতে অংশ নেয়।

এর আগের যতগুলো সাহায্য তহবিল গঠন করা হয়েছিল তার কোনোটি থেকেই তেমন সুবিধা নিতে পারেনি। 'অ্যাডাপটেশন ফান্ড' কিংবা 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' দুটি থেকেই বাংলাদেশ আর্থিক সুবিধা নিতে পারত। কিন্তু বিষয়টি এমন নয় যে আপনার ক্ষতির কথা বলে টাকা চাইলেন আর পেয়ে গেলেন। যেমন 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড'-এর টাকা প্রাপ্তিতে অত্যন্ত কঠোর আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মেনে প্রকল্প প্রস্তাবনা উপস্থাপন করতে হয়। সংস্থার সক্ষমতা আগে যাচাই করে নির্দিষ্ট করা হয় কে এ ধরনের সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারবে বা পারবে না। বাংলাদেশে মাত্র দুটি সংস্থাকে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়নের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আবার প্রস্তাবনাটির কারিগরি বাস্তবতা, আর্থিক ব্যয়ে স্বচ্ছতা এসব বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের পরই আপনি সাহায্য পেতে পারেন। আর সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বড় উন্নয়নশীল দেশগুলোকেই এসব সুবিধা বেশি আদায় করে নিতে দেখা যায়। কিয়োটো প্রটোকলের অধীন, 'সিডিএম'-এর আওতায় 'এমিশন ট্রেডিং'-এর সুযোগ ছিল। বাস্তবে দেখা গেছে, চীন, ভারত, ব্রাজিল ও সাউথ কোরিয়ার মতো দেশগুলোই এর সুবিধা সবচেয়ে বেশি নিয়েছে। 'অ্যাডাপটেশন ফান্ড' কিংবা 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড'-এর ক্ষেত্রেও একই চিত্র। মাত্র কয়েকটি প্রকল্পে এ ধরনের সাহায্য জিততে পেরেছিল বাংলাদেশ।

অনেকের মতে, এটি উন্নত দেশগুলোর অনেকটা চাতুরিপনা। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে এমন শর্ত জুড়ে দিল যে অনেকের পক্ষে সেই সাহায্যের যোগ্য হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এসব নিয়েও আলোচনা,

> উন্নত বিশ্বকে কার্বন নিঃসরণের জন্য বড় আকারে দায়ী করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো তাই তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি করে থাকে। তবে ইদানীংকালে চীনসহ 'ব্রিকস' দেশগুলোতেও নিঃসরণের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। জলবায়ুসংক্রান্ত একমাত্র বৈশ্বিক আইনিভিত্তিক চুক্তিটি ছিল 'কিয়োটো প্রটোকল'। কিন্তু ২০১২ সালে এর সময়সীমা শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে 'প্যারিস চুক্তি' এর স্থান গ্রহণ করেছে বলে বিবেচনা করে হয়। এখন কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ এ ধরনের সম্মেলন বা চুক্তি থেকে কী ধরনের সুবিধা নিতে পারে? উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে দেশের একটি বড় অংশ পানিতে তলিয়ে যাবে। সাইক্লোন, বন্যা কিংবা খরাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়বে বহুগুণে। এর ফলে অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে বাধ্য। তাই ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। সাম্প্রতিক সময়ে 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' খাতে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আছে, তাতেও তার দাবি অগ্রগণ্য হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে সে কতটা সুবিধা নিতে পারছে?

যেমন ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র, এলডিসি, তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর জোট, ইইউ ইত্যাদি।

তবে মূল ভাগ হচ্ছে দুটি—উন্নত এবং উন্নয়নশীল। অফিশিয়াল ভাষায় অ্যানেক্স-১ ও অ্যানেক্স-২ দেশ। উন্নত বিশ্বকে কার্বন নিঃসরণের জন্য বড় আকারে দায়ী করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো তাই তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি করে থাকে। তবে ইদানীংকালে চীনসহ 'ব্রিকস' দেশগুলোতেও নিঃসরণের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। জলবায়ুসংক্রান্ত একমাত্র বৈশ্বিক আইনিভিত্তিক চুক্তিটি ছিল 'কিয়োটো প্রটোকল'। কিন্তু ২০১২ সালে এর সময়সীমা শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে 'প্যারিস চুক্তি' এর স্থান গ্রহণ করেছে বলে বিবেচনা করে হয়।

এখন কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ এ ধরনের সম্মেলন বা চুক্তি থেকে কী ধরনের সুবিধা নিতে পারে? উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে দেশের একটি বড় অংশ পানিতে তলিয়ে যাবে। সাইক্লোন, বন্যা কিংবা খরাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়বে বহুগুণে। এর ফলে অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে বাধ্য। তাই ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। সাম্প্রতিক সময়ে 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' খাতে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আছে, তাতেও তার দাবি অগ্রগণ্য হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে সে কতটা সুবিধা নিতে পারছে?

এক্ষেত্রে উত্তরটি খুবই হতাশাজনক। না, বাংলাদেশ তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে আজকাল। তবে একই সঙ্গে আমাদের দেশের পরিবেশবাদী সংগঠন, সরকারি সংস্থা ও কারিগরি লোকবলের দক্ষতা উন্নয়নও অবশ্য জরুরি। ঘটা করে প্রতি বছর দল বেঁধে 'কপ' সম্মেলনে যত লোক যাচ্ছে, তাদের কতজন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি বোঝে তা প্রশ্নাতীত নয়। একইভাবে সাহায্য প্রকল্প প্রণয়নে দক্ষতা উন্নয়ন ও পরবর্তী সময়ে তার আর্থিক ব্যয়-সংক্রান্ত স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে আরো মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিকরণও সময়ের দাবি।

ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পর অভিযোজনের জন্য টাকার পেছনে ছোটার পাশাপাশি, একজন বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ এ জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে বন্ধ করা যায়, সে লক্ষ্যই বরং আমাদের হওয়া উচিত। একটি অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে এ জলবায়ু সম্মেলন ঘিরে বাংলাদেশেরও তাই প্রত্যাশা হওয়া উচিত যে অবিলম্বে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের ঘনত্ব কমিয়ে আনার ব্যাপারে সমগ্র বিশ্ববাসী যেন কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেয়।

ড. মো. সিরাজুল ইসলাম : অধ্যাপক, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। ইউএনএফসিসি ফেলো ও আইপিসিসি বিশেষজ্ঞ